Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কৃষ্ণকুমারী নাটক ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-মালবিকাগ্নিমিত্রম্-মৃচ্ছকটিকম্ : সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mayna Talukdar
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.10
Pages	১৭১-১৯৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কৃষ্ণকুমারী নাটক ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-মালবিকাগ্নিমিত্রম্-মৃচ্ছকটিকম্ : সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য

Check for updates

মায়না তালুকদার*

বাংলা রেনেসাঁসের সার্থক প্রতিনিধি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। নবযুগের উল্লাস, বেদনা ও সীমাবদ্ধতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্য-নাটক-প্রহসনগুলিতে। বাংলা সাহিত্যের কালবদল, বিশেষ করে মধ্যযুগের অন্ধ তমসাগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল নতুন সাহিত্যে পদার্পণ তাঁরই পদচিহ্ন ধরে ঘটেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগস্রষ্টা বা যুগন্ধর। বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এক শ্রেণির, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের, মধ্যে বিদেশি ভাবধারা যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, দৈনন্দিন জীবনচর্চায় দেশি ভাবধারাকে বর্জন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তবে প্রথম জীবনে তিনি এঁদেরই একজন হলেও পরিণত বয়সে বাংলা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েই তাঁর ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন ঘটেছিল। মায়ের সযত্ন তত্ত্বাবধানে ছোটবেলা থেকেই *রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী* প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি মধুসূদন দত্তের আগ্রহ জন্মেছিল। তাঁর এই সযত্ন তত্ত্বাবধান পরবর্তীকালে মধুসূদন দত্তের কবিসত্তার ভিত্তিভূমি রচনায় পালন করে দূরসঞ্চারী ভূমিকা। সাহিত্যের চর্চা করে অক্ষয় কীর্তি লাভ করবেন এটিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মধুসূদন দত্ত তা করে বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ ঘটিয়েছেন। তাঁর নাট্যরচনাতেই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য নাট্যভাবনা ও সংস্কৃত নাট্যভাবনার সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করেছিলেন। সুতরাং তাঁকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা বলা যায়। জীবন ও জগতের প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টি, সাহিত্যের রূপ ও রীতি, সর্বোপরি প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রকাশে মধুসূদন দত্ত যুগস্রষ্টার ভূমিকাই পালন করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মহালগ্ন। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ প্রাপ্ত একদল শিক্ষিত বাঙালির মনে এক অভিনব নাট্যরসপিপাসা জেগে উঠেছিল। এর ফলে তাঁরা নিজের সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন রঙ্গলাল-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে শিক্ষিত বাঙালির কল্পনায় যে আত্মবোধ ও দেশপ্রীতি জেগেছিল, তা-ই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনোবীজ বলা যায়। বিশেষত ইংরেজি গঠন-রীতিকে আদর্শ করে নাটক রচনা করতে গিয়েও অনেকেই সংস্কৃত নাট্য রচনার গঠন রীতির প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেননি। কারণ সে যুগে ইংরেজি এবং সংস্কৃত

* প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নাটক দুই-ই সমানভাবেই অনূদিত হয়েছিল এবং উভয়ের প্রভাব বাংলা নাট্য-রচনার মধ্যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁদের নব-সাহিত্য প্রচেষ্টার মধ্যে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের মিশ্রণ ঘটেছে তা মোটেই লজ্জার নয়, বরং গৌরবের। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল'। (অজিতকুমার, ১৯৭৬ : ২১)

বাংলা নাটকের উৎপত্তিতে যেমন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অবদান ছিল ঠিক তেমনি সংস্কৃত নাটকের ভূমিকাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক অতিশয় ঐশ্বর্যময়, এর সাহিত্যগুণ এবং নাট্যলক্ষণ দুই-ই যে কোনো দেশের ক্লাসিক পর্যায়ের নাটকের সমগোত্রীয়। একমাত্র গ্রীক নাটক বাদ দিলে পৃথিবীর কোনো দেশের নাটকই সংস্কৃতের মতো সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত নয়। সংস্কৃত নাটকের পিছনে ছিল বহুকালগত ঐতিহ্য যার ব্যাপ্তি বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। ঋগ্বেদের *যম-যমী, পুরূরবা-উর্বশীর* সূক্তগুলোতে নাটকীয় অনিবার্যতা প্রায় একালের মতোই তীব্র হয়ে উঠেছে। উপনিষদের *যম-নচিকেতার* সংবাদ বিবৃতিমূলক হলেও এর অন্তরালে নাট্যরসই প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং বাংলা নাটকের আদর্শই বেশি কার্যকর হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণযোগ্য —

> সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া, পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাঙালি জীবনের ঘটনা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইরূপ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে ধারার সূত্রপাত হইল তাহা আর বাধা পাইল না। (ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৩৫২ : ৩৪)

যদিও ইংরেজদের নাট্যাভিনয় দেখেই বাঙালিদের মনে নাট্য-অভিনয়ের স্পৃহা জেগেছিল কিন্তু বাঙালিরা ইংরেজি আদর্শের মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল না কারণ সংস্কৃত নাটক আকৃতি সৌষ্ঠবে ও বৈষয়িক গৌরবে ইংরেজদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ধারক সংস্কৃত নাটকই বাঙালির প্রথম শরণ্য হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা নাটকের দিকে লক্ষ করলেই এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের *কীর্তিবিলাস*, তারাচরণ শিকদারের *ভদ্রার্জ্জুন*, রামনারায়ণের *বেণী-সংহার*, কালীপ্রসন্ন সিংহের *বিক্রমোবর্শীয়* ও *সাবিত্রী-সত্যবান*, মধুসূদনের *শর্ম্মিষ্ঠা*-এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, বাঙালি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকে এবং পৌরাণিক কাহিনীকে আশ্রয় করেই নাট্য অভিনয়ের পথে অগ্রসর হয়েছিল। তারাচরণ শিকদার প্রণীত *ভদ্রার্জ্জুন* ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত *কীর্তিবিলাস* এই ধারার প্রথম নিদর্শন। নাটক দুটি ইংরেজি শেক্সপিয়রীয় ঢঙে রচিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতি একেবারে বর্জিত হয়নি। *ভদ্রার্জ্জুন* নাটকের ক্ষেত্রে বলা যায়, নাট্যকার ভূমিকায় সংস্কৃতের প্রভাবকে অস্বীকার করে নাটকটি রচনার প্রয়াস ব্যক্ত করেন। কিন্তু নাটকে দেখা যায় নাট্যকার কাহিনি নিয়েছেন *মহাভারত* থেকে। সংস্কৃতানুসারী ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত নাটকের মতোই গদ্য-পদ্য মিশ্রিত করে দীর্ঘ ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। *কীর্তিবিলাস* নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার পাশ্চাত্য ট্রাজেডির অনুসরণে নাটক লেখার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন বটে কিন্তু নাটকের গঠনে তিনি সংস্কৃতরীতি অনুসরণ করেছেন। *কীর্তিবিলাস* সম্পর্কে অজিতকুমার ঘোষের উক্তি প্রণিধানযোগ্য —

> ... ভূমিকায় যে সংস্কৃত নাটকের প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন নাটকে বোধ হয় অজ্ঞাতসারে তাহারই প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য পাশ্চাত্য নাটকের ন্যায় কীর্তিবিলাসও পঞ্চাঙ্ক নাটক। কিন্তু সংস্কৃত নাটক অনুযায়ী আলোচ্য নাটকের গোড়ায় নান্দী ও নান্দ্যন্তে সূত্রধার রহিয়াছে। লেখকের ভাষা ও রচনারীতিও সংস্কৃতের ভারে আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে। নাটকের মধ্যে যে সব অলঙ্কারসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ খেদোক্তি রহিয়াছে সেগুলি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। (অজিতকুমার, ১৯৭৬ : ৩৭-৩৮)

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপিয়রের *Merchant of Venice* অবলম্বনে *ভানুমতী চিত্তবিলাস*, মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের কাহিনি নিয়ে *কৌরব-বিয়োগ* এবং শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে *চারুমুখ চিত্তহরা* নামক নাটক রচনা করেন। হরচন্দ্র ঘোষ সযত্নে সংস্কৃতের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা পারেননি। ক্ষেত্র গুপ্তের মতে, ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করতে গিয়েও তিনি সংস্কৃত নাটকসুলভ নান্দী-সূত্রধারের মোহ ত্যাগ করেননি। (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৮০ : ৫) তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী, নাটকের শুরুতে নান্দী, সূত্রধার ও নটীকে এনেছেন। ভাষা ও সংলাপ সংস্কৃত নাটকের মতোই। আরো উল্লেখ্য, হরচন্দ্র ঘোষ সংস্কৃত নাটকের সংলাপের মতোই অভিজাত শ্রেণির পাত্র-পাত্রীদের মুখে বিদ্যাসাগরীয় ভাষা এবং নিম্ন শ্রেণির পাত্র-পাত্রীর মুখে কথ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। সমসাময়িককালে রচিত *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, কেলিকৌতুক, বিধবা মনোরঞ্জন, বিধবা বিবাহ, সপত্নী, বেণীসংহার, বাবু* প্রভৃতি নাটকেও সংস্কৃত প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। এসব নাটকে সংস্কৃত নাটকের মতোই নান্দী, সূত্রধার, নটী ইত্যাদির উপস্থিতি, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ অলংকারবহুল ভাষার ব্যবহার, অঙ্ক-দৃশ্য বিভাগের ধরন সব কিছুই সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকেই তুলে ধরে। অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন —

> ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা লইয়া অনেক নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সব নাটকের বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নবীনত্ব থাকিলেও ইহাদের শিল্পরীতি ও রচনাভঙ্গি প্রাচীনত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে নাই। নান্দী-সূত্রধার-নটী ইত্যাদির মধ্য দিয়া অধিকাংশ নাটকের আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ এবং সংলাপের দীর্ঘতা ও উচ্ছ্বাসময়তা প্রভৃতির দিক দিয়াও ইহারা সংস্কৃত নাটকের ধারা অনুসরণ করিয়াছে। (অজিতকুমার, ১৯৭৬ : ৪৬)

নবযুগের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিরা সংস্কৃত নাটকের মোহ ত্যাগ করে আধুনিক যুগোপযোগী পাশ্চাত্য নাট্যধারায় দীক্ষিত হয়ে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। এই পরিবেশ পটভূমিকাতেই নাট্যকাররূপে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নবজাগরণের এই ভাব মধুসূদন দত্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে তার সমর্থন ছিল কিন্তু কোনো সক্রিয়তা ছিল না। তাই পাশ্চাত্য ক্লাসিকের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল ঠিকই কিন্তু দেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতিও তাঁর কম শ্রদ্ধা ছিল না। তাই সর্বপ্রথম মধুসূদন দত্তের নাট্যরচনাতেই পাশ্চাত্য নাট্যভাবনা ও সংস্কৃত নাট্যভাবনার সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নাটকে সংস্কৃত নাট্যবৈশিষ্ট্যের বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য-এর যেমন প্রয়োগ ঘটেছে, তেমনি পাশ্চ্যত্যের নাট্যবৈশিষ্ট্যের প্রস্তাবনা, প্রবাহ, চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব, অবরোহ, উপসংহারও স্থিত। তাঁর

প্রথম নাট্যপ্রয়াস *শর্মিষ্ঠা* নাটকে সেই প্রতিফলন পরিলক্ষিত। তাঁর পরবর্তী নাটকগুলোতে অবশ্য এই দুই ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। মোটকথা সংস্কৃত নাট্যাদর্শ এবং পাশ্চাত্য নাট্যচিন্তার বিরোধ এবং সংমিশ্রণের পথ ধরেই বাঙালির নাট্যপ্রয়াস একটি নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে চেয়েছিল। মধুসূদন দত্তের নাট্য-রচনাতেই সেই পথের প্রথম দিকচিহ্ন ধরা পড়েছে।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে *শর্মিষ্ঠা* নাটকে মধুসূদন দত্ত সচেতনভাবেই পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে —

> I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughs be just and glowing, the plot interesting, characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৯৯ : ৫১৯)

তাঁর এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, তা সত্ত্বেও প্রাচ্য ভাবধারায় লালিত মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যরীতিরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর *শর্মিষ্ঠা নাটকে*। এই নাটকে দীর্ঘ সংলাপ, কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা, অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার ও রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস একে সংস্কৃত নাটকের অনুগামী করেছে ঠিকই কিন্তু নাটকটির গঠনে পাশ্চাত্য নাটকের রীতি অনুসরণ করে পঞ্চাঙ্ক বিভাগ, অঙ্কের মধ্যে গর্ভাঙ্ক বিভাগ, নান্দী,[১] নটী ও সূত্রধারের অভিনয় প্রয়োগ পরিত্যাগ করে এবং অঙ্ক মধ্যবর্তী বিষ্কম্ভক প্রবেশক প্রভৃতি অন্তর্দৃশ্যের অবতারণা না করে পাশ্চাত্য সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন সমান্তরালভাবে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক *পদ্মাবতী* (১৮৬০) গ্রীক পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও নাটকটিকে তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশেই উপস্থাপন করেছেন। কাহিনি সংগঠনে, দৃশ্যপরিকল্পনায়, সংলাপরচনায়, রসসৃষ্টিতে ও উক্তি সাদৃশ্যে সংস্কৃত নাটকের আদর্শই মধুসূদন দত্ত অনুসরণ করেছিলেন সমধিক। কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্র সংস্কৃত নাটকেরই গতানুগতিক চরিত্র। মোটকথা, গ্রীক পুরাণের ঘটনার অন্তরালে মধুসূদন দত্ত প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত নাটকের ধারাই অব্যাহত রেখেছিলেন। এরপর মধুসূদন-প্রতিভার পূর্ণ জাগরণ ঘটেছিল *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* (১৮৬১)। নাটকের সুপরিকল্পিত গঠনে, ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে, ট্রাজেডি রূপে *কৃষ্ণকুমারী নাটক* আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও নাটকটির কাহিনি কর্নেল জেমস টড বিরচিত 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে নেওয়া, তবুও মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত নাটকের প্রভাবকে পরিহার করতে পারেন নি। সুতরাং *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* মধুসূদন দত্তের পূর্ণ প্রতিভার প্রকাশ সত্ত্বেও সংস্কৃত নাট্যাদর্শ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস করেও মধুসূদন দত্ত খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকের নাট্যকার কালিদাস-এর *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* ও *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটক এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর নাট্যকার শূদ্রক প্রণীত *মৃচ্ছকটিকম্* নাটক দ্বারা কীভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার সাদৃশ্যের সন্ধান ও স্বাতন্ত্র্য দেখানো হবে এ প্রবন্ধে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট *কৃষ্ণকুমারী নাটকটি* কর্নেল জেমস টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan* গ্রন্থ থেকে ধারণাপ্রসূত এক পরিপূর্ণ ট্রাজেডি নাটক। টড্ তাঁর গ্রন্থের 'Annals of Mewar' খণ্ডের ১৭শ পরিচ্ছেদে *কৃষ্ণকুমারী*-র কাহিনীটি বিবৃত করেছেন। *বিবিধার্থ সংগ্রহে* ১৭৭৯ শকাব্দে পৌষ সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর *কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস* নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা থেকে যে এ নাটকের প্রেরণা আসেনি, সেকথা মধুসূদন দত্ত পরম সুহৃদ কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে জানিয়েছিলেন। তিনি কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—

> For two nights, I set up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A.M. last Saturday the Muses smiled! As a true realiser of Dramatists conceptions you ought to be quite in love with কৃষ্ণকুমারী as I am. Bord! What a Roman Tragedy it will make! (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৯৯ : ৫৪৫)

সুতরাং মধুসূদন দত্ত যে টডের *রাজস্থানের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থ থেকেই তাঁর নাট্যকাহিনি নির্বাচন করেছেন, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে *বিবিধার্থ সংগ্রহে* প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধটিও তাঁর দৃষ্টিপথে পড়তে পারে।

টড-বর্ণিত কাহিনিটি নিম্নে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। *রাজস্থানের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থের মেবার সম্পর্কিত খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে *কৃষ্ণকুমারী*-র কাহিনিটি বিধৃত হয়েছে। ১৭৭৮-১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাণা ভীমসিংহ মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাণা ভীমসিংহকে সম্রাট হিসেবে যেরূপ ভাগ্যের বিপর্যয় বহন করতে হয়েছিল, তেমনি পিতা রূপেও তাঁকে চরম দুঃখ পেতে হয়েছিল। জয়পুর রাজের সঙ্গে ষোড়শবর্ষীয়া রাজকুমারী কৃষ্ণার সম্বন্ধ ঠিক করার প্রয়াসে তিন সহস্র সৈন্যদলসহ জয়পুরের প্রতিনিধিদল উদয়পুরের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেছিল। রাণা ভীমসিংহও সমুদয় উপঢৌকনাদি গ্রহণ করে প্রত্যুপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঁধ সাধলেন মারবারের রাণা মানসিংহ। তিনি দাবি করে বসলেন যে, রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে মারবারের মৃত রাজার সম্বন্ধ হয়েছিল। অতএব রাজকুমারী কৃষ্ণা কেন মারবারের বর্তমান নৃপতির হাতে সমর্পিত হবেন না। তাছাড়া কৃষ্ণার পাণিগ্রহণে তিনি অভিলষিত হয়ে এও বলে পাঠালেন যে, যদি রাণা আমার অভিলাষ পূরণ না করে জগৎসিংহের কাছে কৃষ্ণাকে সমর্পণ করেন, তাহলে সে বিবাহ কিছুতেই সম্পন্ন হতে দিবেন না। এরপর রাজনৈতিক নানান ঘটনার পরে দুর্ভাগা ভীমসিংহ পরাজিত হলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য সদলে নগর মধ্যে পালিয়ে এলেন। ইদিকে জগৎসিংহের কাছে মানসিংহও পরাজিত হয়ে রাজধানীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে মেবারে তখন রাজনৈতিক সংকট চরমে পৌঁছল। জগৎসিংহ, মানসিংহ, মহারাষ্ট্রীয়গণ এবং আমির খাঁ সকলেই কোনো-না-কোনো পক্ষ অবলম্বন করলেন।

আমির খাঁ স্পষ্টই বলল, রাজকুমারী হয় মানসিংহকে বিবাহ করুন, নতুবা আপনার জীবন উৎসর্গ করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করুন; এটা ভিন্ন অন্য উপায় নেই, অন্য পন্থা

অবলম্বন করতে গেলেই রাণা মহাসঙ্কটে পতিত হবেন। ভীমসিংহ এ সকল বিবরণ শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন যে, আমির খাঁর কথা না রাখলে উদয়পুর ছারখার হয়ে যাবে। একদিকে স্বর্গীয় সুকুমার অপত্যস্নেহ তাঁর হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃতধারা সিঞ্চন করতে লাগল, অপরদিকে আমির খাঁর কঠোর অনুশাসন মেবার রক্ষার ভবিষ্যৎ চিত্র সম্মুখে ধারণ করে সেই সুকুমার হৃদয়কে কঠোর করে তুলতে লাগল। ভীমসিংহের স্বর্গীয় পিতার অন্যতমা উপপত্নীর গর্ভজাত যৌয়ানদাসকে কৃষ্ণা হত্যায় নিয়োজিত করা হলে তাঁর কঠিন হৃদয় মুহূর্তের জন্যও কম্পিত হল না। কিন্তু যখন সেই লাবণ্যবতীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য তাঁর নয়নপথে পতিত হল, তখন যৌয়ানদাসের সর্বাঙ্গ শিহরিত হল, তাঁর হস্ত হতে শাণিত ছুরিকা খসে পড়ল। তিনি নিতান্ত দীনভাবে সেই গৃহ হতে প্রস্থান করলেন। অবশেষে বিষপ্রয়োগে তার হত্যার আদেশ দেয়া হল।

একজন রমণী সেই গরল প্রস্তুত করে রাণার নামে কৃষ্ণকুমারীর হস্তে অর্পণ করল। সুকুমারী সরলা কৃষ্ণা ধীরভাবে অকম্পিত হস্তে সেই বিষপাত্র গ্রহণ করলেন; তাঁর মস্তকের একগাছি কেশও কম্পিত হল না; তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ত্যাগ করলেন না। ঈশ্বরের কাছে পিতার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে তিনি অবিকৃত হৃদয়ে সেই পাত্রস্থ বিষ পান করে ফেললেন। কিন্তু তিনবার বিষ পান করেও তার মৃত্যু হল না। টড লিখেছেন—

> For the third time, nature refused to aid the horrid purpose. It seemed as if the fabled charm, which guarded the life of the founder of her race was inherited by the virgin Krishna. But the bloodhounds the pathan and Ajit were impatient till their victim was at rest. (ভবানীগোপাল, ১৯৮৬ : ১০১)

এরপর তাকে কুসুমরস মিশ্রিত অহিফেন দেওয়া হল। কুমারী সানন্দে তা পান করলেন। টড লিখেছেন— She slept! a sleep from which she never awoke. এভাবে the desires of barbarity were accomplished. (ভবানীগোপাল, ১৯৮৬ : ১০১)

মধুসূদন দত্ত টডের বর্ণিত ঘটনাসমূহ পরিবর্তিত বা বিকৃত না করে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। সামান্য কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন ঠিকই কিন্তু মূল অংশ থেকে বিচ্যুত হননি। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক রূপে রূপ দেওয়া একমাত্র মধুসূদন দত্তের পক্ষেই সম্ভব ছিল। *কৃষ্ণকুমারী*-র শোকাবহ কাহিনী তাঁর শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করেছিল বলেই ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটা যুদ্ধবিগ্রহ তিনি পশ্চাৎপটে রেখে সমস্ত উদয়পুরের ঘটনার অভিব্যক্তি যেন ব্যক্ত করেছেন। মেবারের রাজা ভীমসিংহ বীরত্বহীন হয়ে পড়ার ফলে নিতান্ত রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে নিরপরাধ নিষ্পাপ সরলা কন্যাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। এই নিদারুণ ঘটনাটিকে রূপ দেবার জন্য মধুসূদন দত্ত *কৃষ্ণকুমারীর* কাহিনীটিকে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ইতিহাস রচনা করার জন্য *কৃষ্ণকুমারী নাটকটি* রচনা করেননি। কৃষ্ণকুমারীর জীবনের মর্মচ্ছেদী পরিণাম দেখানোই তাঁর *কৃষ্ণকুমারী নাটকের* মূল লক্ষ্য ছিল। অভিমানিনী কৃষ্ণার করুণ মৃত্যুকে প্রাধ্যন্য দিয়েই মধুসূদন দত্ত ইচ্ছাকৃতভাবেই মূল কাহিনীর কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। কারণ মধুসূদন দত্তের ইচ্ছা ছিল ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এক নিষ্পাপ তরুণীর নির্মম ট্রাজেডি রচনা করা। সেই আকাঙ্ক্ষাই সার্থক করে তুলেছেন *কৃষ্ণকুমারী নাটকে*। তবে মধুসূদন দত্ত কয়েকটি চরিত্রের

নামের পরিবর্তন করেছেন। যেমন, জোয়ানদাস হয়েছেন বলেন্দ্র সিংহ, কর্পূরমঞ্জরী হয়েছেন বিলাসবতী, মন্ত্রী সতীদাস হয়েছেন সত্যদাস, আর এরই সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র যেমন, ধনদাস, মদনিকা, তপস্বিনী প্রমুখ। নাট্যপ্রয়োজনেই তিনি এই কাল্পনিক চরিত্রগুলি গড়ে তুলেছেন। মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয়াসক্ত হবার বিষয়টিও কবির কল্পিত। এ কল্পনা কৃষ্ণার রোমান্টিক মনোভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। মধুসূদনের কাহিনিটি এরূপ—

উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের একমাত্র কন্যা কৃষ্ণকুমারী। তাঁর সৌন্দর্যের কথা শুনে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ উদয়পুরে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠালেন। জগৎসিংহের এক রক্ষিতা ছিলেন, তার নাম বিলাসবতী। কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে জগৎসিংহের যাতে বিবাহ না হতে পারে বিলাসবতী সেজন্য নানান কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় তার সখী মদনিকা পুরুষবেশে উদয়পুরে গিয়ে কৃষ্ণকুমারীকে মরুদেশের রাজা মানসিংহের চিত্রপট দেখিয়ে অনুরক্ত করে তোলেন। এদিকে মানসিংহকে বিলাসবতী এক কৃত্রিম পত্র দিয়ে কৃষ্ণকুমারীর আসক্তির কথা জানালে মানসিংহ বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে উদয়পুরে দূত পাঠালেন। এদিকে উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ স্বদেশরক্ষার্থে বারবার যুদ্ধ করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় জগৎসিংহ অথবা মানসিংহ কারো সাথেই তার যুদ্ধে লড়ার মতো শক্তি ছিল না। তার ইচ্ছা জগৎসিংহের সাথেই কৃষ্ণকুমারীর বিয়ে হোক। কিন্তু এদিকে কৃষ্ণকুমারীর মন পড়িয়াছে মানসিংহের উপর এবং রাজমহিষীর ইচ্ছাও তাই। ভীমসিংহ উভয় সংকটে পড়লেন। উদয়পুরের প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্রপতি মানসিংহের হাতে কৃষ্ণকুমারীকে অর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। এদিকে জগৎসিংহ মানসিংহ উভয়েই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করতে না পারলে উদয়পুর ধূলিস্যাৎ করবেন। তাই রাজমন্ত্রী ভীমসিংহকে পরামর্শ দিলেন যে, এই বিপদ হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু। তিনি আরো বলেন, একজনের মায়ায় শতসহস্র জনকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করা অনুচিত। তিনি এও বলেন যে, বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক চিরস্থায়ী নয়। তাঁর কথায় রাণার মনে প্রবল সংঘাত সৃষ্টি হল। একদিকে অপত্যস্নেহ, অন্যদিকে রাজপরিবার ও রাজ্যের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁর মনকে বিচলিত করে তুলল। প্রাণপ্রতিমাকে বির্সজন দিতে হবে — এই চিন্তায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। তাই তিনি এই নিদারুণ কাজের ভার দিলেন রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের উপর। বলেন্দ্রসিংহ কৃষ্ণাকে বধ করার জন্য তার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হলেন ঠিকই কিন্তু হত্যা করতে পারলেন না। কৃষ্ণকুমারী তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে খড়গাঘাতে আত্মহত্যা করে পিতৃব্যের কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করলেন। কন্যার মৃত্যুর জন্য স্বামী ভীমসিংহকে দায়ী করে অহল্যা বাই আত্মাহূতি দিলেন আর ভীমসিংহ উন্মাদ হয়ে গেলেন। *কৃষ্ণকুমারী নাটকের* এভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল।

কৃষ্ণকুমারী নাটক-ই বাংলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক ও প্রথম ট্রাজেডি নাটক। এ নাটকে গ্রীক নাটকের অদৃশ্য নিয়তির লীলা পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণকুমারী গ্রীক ট্রাজেডির অপরিহার্য নিয়তির মতো সমগ্র নাটকটির উপর চেপে আছে। ইউরিপিদেস্-এর *ইফিগেনিয়া* নাটকের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ করা যায় কৃষ্ণকুমারীর পরিণতিতে। উদয়পুরের রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রটি শেক্সপিয়র প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ নাটক *The life and Death of King John*-এর অন্তর্ভুক্ত রবার্ট ফেলকনব্রিজের বৈমাত্রেয় ভাই ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড-এর চরিত্রের অনুকরণে রচিত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেও তা তাঁর একটি পত্রে স্বীকার করেছেন। এছাড়া মদনিকা পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে যে সকল দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন

নাটকে সেই ধারণাও মধুসূদন পেয়েছিলেন শেক্সপিয়রের নাটক হতে। শেক্সপিয়রের রচিত *As You Like It* নাটকের স্ত্রী চরিত্র *Gan mede* পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করেছিল। *Merchant of Venice* নাটকের স্ত্রী চরিত্র Portia-ও পুরুষবেশে অভিনয় করেছিল। কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুতে পিতা ভীমসিংহ কন্যা শোকে উন্মত্ত হয়ে যে আচরণ করেছিলেন, তা শেক্সপিয়র রচিত *King Lear* নামক বিষাদান্তক নাটকের শেষ দৃশ্যে কন্যার শোকে উন্মত্ত রাজা লীয়রের আচরণের অনুরূপ বলেই মনে হয়। (আশুতোষ, ২০০২ : ২১৪)

উপরে আলোচিত পাশ্চাত্য নাটকের প্রভূত প্রভাব *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* থাকা সত্ত্বেও এই নাটকের কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না। *পদ্মাবতী* নাটক রচনার পর মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন যে — যদি এরপর আর কোনো নাটক রচনা করি তাহলে কখনোই বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের নির্দেশাদি দ্বারা নিজেকে সীমিত রাখব না, আদর্শ গ্রহণের জন্য আমি ইউরোপের খ্যাতিমান নাট্যকারদের দ্বারস্থ হব। (খসরু, ২০০৭ : ৬৮) ইউরোপীয় নাট্য-চেতনার আলোকে তিনি বাংলা নাটককে বর্ণিল করতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের ফলে প্রাচ্য নাটকের প্রভাবকে তিনি *কৃষ্ণকুমারী নাটকেও* এড়িয়ে যেতে পারেননি বলে তাঁর মনের ভিতর যে সুপ্ত পৌরাণিক জগৎ লুকিয়ে ছিল তা বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন সংলাপের মাধ্যমে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

গবেষকগণ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন বলে কালিদাসকে স্বীকার করেছেন। বিক্রমাদিত্যের সময় থেকেই বিক্রম সংবৎ চালু হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৫/৭ অব্দে। সেই হিসেবে কালিদাস খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলা চলে। তাঁর কালজয়ী তিনটি নাটকের মধ্যে *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এর নাট্যগুণ, চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-বিন্যাস, দৃশ্য-পরিকল্পনা, রস-নিষ্পত্তি সবকিছুই বিস্ময়কর। নাটকটি *মহাভারত* প্রসিদ্ধ দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়বৃত্ত অবলম্বন করে রচিত হলেও তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এ নাটকটি সৃষ্টি করেছেন। কাহিনিটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো —

পুরুবংশের রাজা দুষ্যন্ত এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলার প্রণয় কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। নাটকটি সাত অঙ্কে সমাপ্ত। রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বেরিয়ে মালিনী নদীর তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হয়ে কণ্বের পালিত কন্যা শকুন্তলার অনুপম রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করেন। অনতিবিলম্বে তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা দুষ্যন্ত চলে গেলেন। যাবার সময় তাকে দিয়ে গেলেন একটি অঙ্গুরীয়। শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় এতই অন্যমনস্ক ছিলেন যে, ঋষি দুর্বাসার প্রতি অতিথি সৎকারের কর্তব্যও ভুলে গেলেন ফলে শকুন্তলার জীবনে নেমে এল অভিশাপ। দুর্বাসা মুনি তাঁকে অভিশাপ দিলেন— 'বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যামানসা' অর্থাৎ যাঁর স্মৃতিতে বিভোর শকুন্তলা, তাকে মনে করিয়ে দিলেও শকুন্তলাকে সে চিনতে পারবে না।' পরে সখীদের

অনুরোধে দুর্বাসা মুনি বললেন, যে কোন অভিজ্ঞান বা স্মারক চিহ্ন দেখাতে পারলে শাপের অবসান হবে। অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলা পতি গৃহে গেলে দুষ্যন্ত তাঁকে চিনতে পারলেন না। শোকে-দুঃখে-বেদনায় শকুন্তলা স্বর্গে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। ইতোমধ্যে এক ধীবরের কাছে থেকে অঙ্গুরীয় ফিরে পেয়ে রাজা দুষ্যন্তের সকল কথা মনে পড়ে গেল। পরে ইন্দ্রের আহ্বানে দুষ্যন্ত স্বর্গে গিয়ে দানব বিনাশ করে ফেরার পথে ভগবান মারীচের আশ্রমে স্ত্রী শকুন্তলা ও পুত্র ভরতের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলা ও পুত্র ভরতকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* নাটকটি কবিকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে, প্রত্যক্ষভাবে ওই নাটকের বহুবাক্য এবং পরিস্থিতি তাঁর নাটকগুলোতে অনুসৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য —

> তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকখানির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারিখানি নাটক বিভিন্ন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইলেও ইহাদের বিভিন্ন অংশ রচনায় তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কালিদাসের বহু চিত্র তিনি তাহার নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন, বহু চরিত্রের নামকরণের সন্ধানও তিনি সেখান হইতেই পাইয়াছেন। (আশুতোষ, ২০০২ : ১৪৯)

কৃষ্ণকুমারী নাটকটি পড়ে অনুভব করা যায় যে, মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্-এর* নায়িকা শকুন্তলার আদলে। কৃষ্ণকুমারীর স্বভাবের ব্যক্তিলক্ষণ ও বিশিষ্টতা সত্ত্বেও প্রকৃতির মানসকন্যা শকুন্তলার স্বভাবের কোমলতা ও তার নান্দনিক সৌন্দর্য সবকিছুর ছায়াই যেন কৃষ্ণকুমারীকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। কালিদাসের শকুন্তলার আদর্শে কৃষ্ণকুমারী তাই মধুসূদনের এক অনুপম রূপায়ণ।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের তৃতীয় অঙ্কের, ২য় গর্ভাঙ্কে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে কৃষ্ণকুমারী বলেছে— আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমী বৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি? আহা! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছো ? (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৪৯) অনুরূপ সংলাপ আমরা *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার মুখ থেকে শুনতে পাই—

> শকুন্তলা— (লতামুপেত্য) বনজ্যোৎস্নে, চূতসঙ্গতা অপি মাং প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতাভিঃ শাখাবাহাভিঃ। অদ্য প্রভৃতি দূরপরিবর্তিনী ভবিষ্যামি'। অর্থাৎ শকুন্তলা (লতার কাছে গিয়ে) বনজ্যোৎস্না, তুমি সহকার তরুকে বেষ্টন করে থাকলেও এদিকে প্রসারিত তোমার লতার বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করো। আজ থেকে আমি দূরে চলে যাচ্ছি। (কালিদাস, ১৯৯২ : ২৯২-২৯৩)

আশ্রম-প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার যেমন গভীর ও নিবিড় বন্ধন তেমনি একই রূপ না হলেও উপবনের বৃক্ষ লতা-পাতা পুষ্পের সঙ্গেও কৃষ্ণকুমারীর ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধন। শকুন্তলার মনের নিভৃতে আলো ফেলে মধুসূদন আঁকতে চেয়েছেন কৃষ্ণকুমারীকে। স্বাভাবিকভাবেই

তাই শকুন্তলার অনুভূতিগুলোও যেন কখনো কখনো সঞ্চারিত হয়েছে কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও সংলাপের মাধ্যমে কৃষ্ণকুমারীর জীবনের নানা মুহূর্ত শকুন্তলার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছে।

এছাড়া কৃষ্ণকুমারীকে দেখে তার রূপে বিমোহিত হয়ে তাকে পাবার জন্য জগৎসিংহের মধ্যে যে ব্যাকুলতা শুরু হয়েছিল তা যেন দুষ্যন্তের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে ধনদাসের কাছ থেকে কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপটখানি দেখে জগৎসিংহ বললেন— 'মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো?' (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৬) ১ম অঙ্কের, ১ম গর্ভাঙ্কে তিনি আবার বললেন— 'আহা, এমন মহার্ঘ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন।' (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৯)

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে রাজা দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে তপোবনে প্রথম দেখলেন তখন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে দুষ্যন্তও তাঁর মনের মধ্যে শকুন্তলার নানান ছবি এঁকে বলেছিলেন—

> মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
> ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।।১/২৩ (কালিদাস, ১৯৯২ : ৯৪)

অর্থাৎ মানবীতে এই রূপের সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? বিদ্যুতের ছটা মাটি থেকে উঠে না।

> রাজা (আত্মগতম্)
> কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্ত তদ্ভাবদর্শনায়াসি।
> অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে।। ২/১(কালিদাস, ১৯৯২ : ১২৫)

অর্থাৎ রাজা (নিজের মনে) — প্রিয়া শকুন্তলাকে যে সহজে পাবার নয়, তা মানি। কিন্তু আমার মন তার ভাব জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। কারণ প্রেম তার অভীষ্ট লাভে সমর্থ না হলেও একে অপরকে পেতে চায় — অন্তত এটুকু জেনেও আনন্দ পেয়ে থাকে।

কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* প্রণয়মূলক মিলনান্তক নাটক আর *কৃষ্ণকুমারী নাটক* রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত বিয়োগান্তক নাটক। যদিও ভিন্নধর্মী দুটি নাটক তবুও কিছু কিছু জায়গায় উভয় নাটকে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে শকুন্তলা আর কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রগত মিল এবং রাজা দুষ্যন্ত ও রাজা জগৎসিংহের প্রেমের ব্যাকুলতা। সুতরাং এখানেও মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত নাটক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

সংস্কৃত নাটকে পট বা আঁকা ছবি দেখে নাটকের পাত্রপাত্রীর মানসিক পরিবর্তন দেখানো বহুল প্রচলিত একটি কৌশল। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃষ্ণকুমারীর পট অবলোকনে রাজা জগৎসিংহের যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়েছেন তা সংস্কৃত নাটক *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত অতি সংক্ষেপে

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো — বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয় অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক *মালবিকাগ্নিমিত্রম্*। ঘটনাচক্রে রাজকুমারী মালবিকা শবরদের দ্বারা অপহৃতা হয়ে অগ্নিমিত্রের রাজ-অন্তঃপুরে পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হন। রাজা অগ্নিমিত্র চিত্রাঙ্কিত পটে মালবিকার চিত্র দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন এবং তার পরিচয় জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। কিন্তু অগ্নিমিত্রের মহিষীগণ সর্বদা মালবিকাকে রাজার চোখের আড়ালে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিদূষকের সহায়তায় অগ্নিমিত্র মালবিকাকে দেখতে পান এবং প্রমোদকাননে তাঁদের মিলন হয়। কিন্তু ওই সময় কনিষ্ঠ মহিষী ইরাবতী হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে অগ্নিমিত্রকে নানান কটুবাক্যে জর্জরিত করে মালবিকাকে গৃহবন্দি করে ফেলেন। এরূপ নানান ঘটনার পরে মালবিকার পরিচয় উদঘাটিত হল এবং মহিষী ধারিণী ও ইরাবতীর সম্মতিতে অগ্নিমিত্রের সাথে মালবিকার মিলন ঘটল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজসহচর ধনদাস রাজা জগৎসিংহকে ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট দেখালেন। পটে কৃষ্ণকুমারীকে দেখে তাঁর মনোলোকের প্রণয়াবেগ নিম্নোক্ত সংলাপাংশে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে —

ধনদাস : আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করচি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তেই আমি এখানে আনলেম।

রাজা : (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এ কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধনদাস : মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা : তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধনদাস : মহারাজ, এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। ...ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা...এর নাম কৃষ্ণকুমারী।

রাজা : (পট অবলোকন করিয়া) আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্ম গ্রহণ করেছেন; সে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও...। এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ইত্যাদি ইত্যাদি। (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৪-৫)

অনুরূপ চিত্রদর্শন ও রাজার প্রণয়াবেগ আমরা *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখতে পাই। মহিষী ধারিণীর পরিচারিকা কৌমুদিকা ও মালবিকার প্রিয়সখী বকুলাবলিকার কথোপকথন থেকে এর যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়—

বকুলাবলিকা : সেদিন রানীমা চিত্রশালায় গিয়ে কতগুলি সদ্য আঁকা চিত্রের রং ও রেখা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলেন; এমন সময় রাজামশায় সেখানে উপস্থিত হলেন।

কৌমুদিকা : তারপর, তারপর?
বকুলাবলিকা : তারপর স্বাভাবিক ভাব বিনিময়ের পর রানীমার পরিজনদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের পরিচারিকাকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—
কৌমুদিকা : কি, সেটা কি?
বকুলাবলিকা : দেবী, তোমার পাশেই চিত্রিতা এই মেয়েটি তো খুব সুন্দর, এর নাম কি?
কৌমুদিকা : তারপর, তারপর।
বকুলাবলিকা : তারপর তাঁর কথায় কোন উত্তর না পেয়ে রাজা সন্দিগ্ধ হয়ে বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তখন পাশে অবস্থিত ধারিণীর ভগিনী বসুলক্ষ্মী বললেন—এই হল মালবিকা। (কালিদাস, ১৯৮৬ : ৫৪-৫৫)

এরপর মালবিকাকে বাস্তবে দেখার জন্য রাজা উদ্‌গ্রীব হয়ে বিদূষককে সমস্ত বিষয় অবগত করলেন। বিদূষকের চাতুর্যে রাজা যখন মালবিকাকে দেখলেন, তখন বললেন—

চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা ॥ ২/২ (কালিদাস; অজ্ঞাত : ৩৪৬)

অর্থাৎ যখন একে ছবিতে প্রথম দেখি, তখন ভেবেছিলাম, এত রূপ মানুষের হয় না। এখন একে প্রত্যক্ষভাবে দেখে মনে হচ্ছে, যে চিত্রকর সেই ছবিখানি এঁকেছিল, হয় সে মন দিয়ে একে ভালো করে দেখেনি, না হয় চিত্র করতে সে আদৌ জানে-ই না।

সুতরাং *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে পটে চিত্রিত মালবিকার চিত্রদর্শন করে রাজার মনোভাবের অভিব্যক্তি আর *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট দেখে রাজা জগৎসিংহের মনোলোকে প্রণয়াবেগের অভিব্যক্তি একান্তই অভিন্ন।

মৃচ্ছকটিকম্

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর নাট্যকার শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিকম্* একটি বিখ্যাত প্রকরণ[২] শ্রেণির দৃশ্যকাব্য। নাটকের প্রস্তাবনা অংশ হতে শূদ্রকের যে পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে, তাতে জানা যায়, তিনি রূপবান, বিদ্বান, চতুঃষষ্টি কলায় পারদর্শী, এবং যুদ্ধপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি একশ বছর পরমায়ু অতিবাহিত করে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করার পর অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন।[৩] তাঁর *মৃচ্ছকটিকম্* সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এই নাটকের কাহিনি ও বিষয়বস্তু কালিদাসোত্তর যুগের গতানুগতিক নাট্যধারায় সম্পূর্ণ অভিনব। দশ অঙ্কে বিন্যস্ত এই প্রকরণটিতে পাশাপাশি দুটি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মুখ্য কাহিনি চারুদত্ত-বসন্তসেনার প্রেম এবং গৌণ কাহিনি রাষ্ট্রবিপ্লব। এই নাটকের নায়ক চারুদত্ত একজন সচ্চরিত্র, সুশীল, উদারহৃদয় বিত্তশালী বণিক। কিন্তু মহানুভবতার জন্যে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করে অর্থদৈন্যে পতিত। কামদেবের মন্দির উদ্যানে চারুদত্তকে দেখে বসন্তসেনা নাম্নী এক বারবনিতা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এ আকর্ষণ দেহের নয়, মনের। বসন্তসেনার দেহপ্রার্থী কূট-কৌশলী অত্যাচারী রাজা পালকের শ্যালক শকার। একদিন সন্ধ্যায় শকার বসন্তসেনার পিছু নিলে বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন এবং তাঁর কাছে নিজের

মূল্যবান অলংকার গচ্ছিত রাখেন। বসন্তসেনার দাসী মদনিকার প্রেমিক শর্বিলক চারুদত্তের গৃহের সিঁদ কেটে সেই অলংকারগুলি চুরি করে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেগুলি আবার বসন্তসেনারই হাতে এসে পড়ে। একদিন চারুদত্তের পুত্র রোহসেন সোনার গাড়ির জন্যে বায়না ধরে। কিন্তু সোনার গাড়ি দেবার ক্ষমতা চারুদত্তের নেই তাই সে মাটির গাড়ি রোহসেনকে দেয়। কিন্তু তাতে রোহসেনের কান্না থামে না। এ দৃশ্য দেখে বসন্তসেনা রোহসেনকে সোনার গাড়ি গড়িয়ে দেবার জন্য অলংকারগুলি দিয়ে দেয়। বসন্তসেনার এই ঔদার্য চারুদত্তকে মুগ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়।

অন্যদিকে বসন্তসেনার প্রণয়প্রার্থী শকার চারুদত্তের প্রতি বসন্তসেনার অনুরাগ বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বসন্তসেনাকে ভীষণ প্রহার করাসহ নানাবিধ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত সে সফল হতে পারে না। পরিণামে চারুদত্ত নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি পান। রাজা আর্যকের নির্দেশে বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূরূপে পরিগৃহীতা হন।

মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়িকা গণিকা বসন্তসেনা ও তার পরিচারিকা মদনিকার সাথে *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের বারাঙ্গনা বিলাসবতী ও তার পরিচারিকা মদনিকা চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর উক্তি স্মরণীয়—

> *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকা ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন সম্ভবত *মৃচ্ছকটিক* নাটকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন। *মৃচ্ছকটিক* নাটকের মদনিকার ন্যায় কৃষ্ণকুমারী'র মদনিকাও বুদ্ধিমতী, চতুরা, দয়াবতী এবং সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে ক্রূরস্বভাবা। ...*কৃষ্ণকুমারী নাটকের* বিলাসবতীও *মৃচ্ছকটিকের* বসন্তসেনার ন্যায় প্রণয়াস্পদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিনী। (যোগীন্দ্রনাথ, ১৯২৫ : ৩১০)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, নাটক দুটি যেহেতু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত সেহেতু এতে কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, নায়িকাগত সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট।

প্রথমত, নাটক দুটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায়, একদিকে নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনী আর অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্থান-পতন— এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নাটক দুটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, বিলাসবতী জগৎসিংহের রক্ষিতা। কিন্তু তার হৃদয় এই পরিচয়ের সীমায় বদ্ধ থাকেনি। রাজা জগৎসিংহকে বিলাসবতী সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর প্রতি জগৎসিংহের অনুরাগে বিলাসবতী বেদনার্ত হয়েছেন; যুদ্ধ গমনকালে বিচ্ছেদে একান্ত কাতর হয়েছেন। সুতরাং মধুসূদন একজন সামান্য রক্ষিতাকে প্রেমের যে রাজটীকা পরিয়ে মনুষ্যত্বের আসনে বসিয়েছেন তা সত্যিই দুর্লভ। এই অনুরূপ ঘটনা আমরা *মৃচ্ছকটিকে*ও দেখতে পাই। বসন্তসেনা গণিকা হয়েও ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং সে ভালোবাসা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ প্রসঙ্গে A. B. Keith-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। A. B. Keith *The Sanskrit Drama*-য় বসন্তসেনার চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—

> Not less attractive is Vasantasena, bound despite, herself to a profession which has brought her great wealth but which offends her heart; the judge and all the others believe her merely carried away by sensual passion; Charudutta and his wife alone recognize her nobility of soul and realize how much it means for her to be made eligible for marriage to her beloved. (Keith, 1998 : 134)

বসন্তসেনা বারবনিতা হলেও তার অন্তর ছিল কোমল ও সহানুভূতিশীল। তাই যখন মিথ্যা অপবাদে চারুদত্তকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছিল তখন বসন্তসেনা নিজের জীবনের বিনিময়ে চারুদত্তকে রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্রকও একজন সামান্য বারবনিতাকে প্রেমের রাজমুকুট পরিয়েছেন, যা সত্যিই অনন্য।

তৃতীয়ত, কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিংহের মধ্যে বিরোধ এবং অবশেষে কৃষ্ণার আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে নাটকের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় *মৃচ্ছকটিক* নাটকেও। নটী বসন্তসেনা ও চারুদত্ত একে অপরকে ভালোবাসেন। কিন্তু রাজা পালকের শ্যালক শকার বসন্তসেনাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। প্রসঙ্গত বিভিন্ন কূটনৈতিক চালের মাধ্যমে তাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তার মধ্যে প্রতিশোধ লিপ্সা জেগে ওঠে। শকারের সমস্ত কূটনৈতিক চাল ভেস্তে যায় এবং বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

চতুর্থত, রাজা জগৎসিংহ যেমন রক্ষিতা বিলাসবতীর প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন, চারুদত্তও তেমনি গণিকা বসন্তসেনার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। প্রসঙ্গত *কৃষ্ণকুমারী নাটক* থেকে প্রাসঙ্গিক সংলাপ তুলে ধরা হল—

> রাজা জগৎসিংহ : বিলাসবতী কোথায়? (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন?
> এ কি—এ কয়েক দিন না আসাতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? ...দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৬১)

মৃচ্ছকটিক নাটকের ৫ম অঙ্কে আছে—

> চারুদত্ত : ও বসন্তসেনা এসেছে। (সহর্ষে উঠে) প্রিয়ে! আমার সন্ধ্যা সর্বদাই বিনিদ্রভাবে কাটে, রাত্রিও সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই কেটেছে। হে বিশাল লোচনে! তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছি বলে আজকে আমার এই সন্ধ্যা দুঃখ দূর করেছে। ৫/৩৭ (শূদ্রক, ১৯৮৬ : ২৮৮)

এই নাটক দুটিতে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি পরিলক্ষিত হয়। *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য রাজনীতির কূটনৈতিক প্রতিহিংসায় লিপ্ত হয়ে দুই রাজার কৃষ্ণকুমারীকে লাভের প্রচেষ্টা; অপরপক্ষে *মৃচ্ছকটিকে*-র প্রধান উপজীব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ। *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* নায়ক জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারীর রূপ দেখেই উন্মাদ হয়েছেন আর অপরটিতে নায়ক চারুদত্ত ও

বসন্তসেনা শুধু পরস্পরের প্রতি রূপমুগ্ধ নন, গুণেও অভিভূত। রাজা জগৎসিংহ অবিবাহিত কিন্তু তার বিলাসবতী নাম্নী একজন রক্ষিতা ছিল আর চারুদত্ত বিবাহিত কিন্তু বসন্তসেনা নাম্নী এক গণিকার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অপরপক্ষে কৃষ্ণকুমারী ধীরা, বিশ্রদ্ধা এবং পিতার সম্মানার্থে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন। অপরপক্ষে বসন্তসেনা গণিকা হলেও মানবিক গুণাবলি ছিল অতি উচ্চে। যার কারণে চারুদত্তকে ভালোবেসে তিনি গণিকাবৃত্তি পরিহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে যারা সবচেয়ে সজীব, ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে যাদের অপার উদ্যম, অনৈতিহাসিক চরিত্র হয়েও যারা মূল কাহিনিকে অনেক পরিমাণে পরিচালিত করেছে, তারা হল— ধনদাস ও মদনিকা। জগৎসিংহের তাবৎ দুষ্কর্মের সহায়ক এই ধনদাস। ধনদাসই কৃষ্ণকুমারীর চিত্র এনে জগৎসিংহের মনে রূপলালসা সৃষ্টি করেছে এবং তার ফলে কৃষ্ণকুমারীর জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। ধনদাসের উদ্দেশ্য ছিল— অর্থপ্রাপ্তি ও বারাঙ্গনা বিলাসবতীকে আয়ত্ত করা। কৃষ্ণকুমারীর ক্ষতি করতে সে চায়নি কিন্তু অর্থের জন্য তা করতেও সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তার মধ্যে সততা, কৃতজ্ঞতা, নীতিবোধ কিছুই নেই। এ প্রসঙ্গে তার একটি সংলাপ তুলে ধরা হল—

> আরে, একালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে! কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয়; কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়; কারো বা দুটো কথায় মন রাখতে হয় আর কারু কারু মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ যেমন কর্য্যে হৌক, আপনার কার্য উদ্ধার করা চাই! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে সেটা কি মানুষ? ১/১ (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ১১)

ধনদাস সম্পর্কে রাজা জগৎসিংহের মূল্যায়ন— ধনদাস যে পরম ধূর্ত আর পরম স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি ; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৬৩)

ধনদাসের চরিত্রের ক্ষেত্রে শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিক* নাটকের রাজা পালকের শ্যালক ভিলেন সংস্থানক (শকার)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক পরিচয়ে তিনি রাজা পালকের অপরিণীতা উপপত্নীর ভাই। তিনি অশিক্ষিত শুধু নন; ধূর্ত, লোভী, কামুক, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অত্যাচারী ও শঠ। অন্যান্য বিষয়ে তার মূর্খতা প্রকাশিত হলেও স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে তার পটুতা প্রচুর। নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে—

> (সহর্ষে কান দিয়ে) ফাটা কাঁসার আওয়াজের মতো খন্‌খনে চণ্ডালের গলার স্বর কানে আসছে। যে রকম ঢেঁড়া আর ঢাকের বাদ্যি শুনছি তাতে মনে হচ্ছে দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই দেখি। শত্রুবিনাশে, সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। কোন বিষাক্ত গুল্মের মধ্যে লুকানো পোকার মতো, আমি বুদ্ধি করে দরিদ্র চারুদত্তের বিনাশ করলাম। এখন নিজের প্রাসাদের নতুন বানানো উঁচু চত্বরে উঠে নিজের পরাক্রম দেখব। (শূদ্রক, ১৯৮৬ : ৩৩১-৩৩২)

কৃষ্ণকুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারীর শোচনীয় পরিণতিকে ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও সফল ভূমিকা পালন করেছেন যিনি তিনি হলেন বিলাসবতীর সহচরী মদনিকা। তার বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুঃসাহসিকতা ও রহস্যপ্রিয়তা তাকে সত্যিই নাটকে উপজীব্য করে তুলেছে। বিলাসবতীর প্রেম সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করবে না তা জেনেও সে কৃষ্ণকুমারীর নামে রাজা মানসিংহকে জাল প্রেমপত্র লিখেছে; আবার রাজা মানসিংহের নকল চিত্রপট এঁকে কৃষ্ণকুমারীর সহজ-সরল মনকে তাঁর প্রতি অনুকূল করিয়েছে। আবার পুরুষের ছদ্মবেশে নগরে ভ্রমণ করে কখনও ধনদাসকে বিপদগ্রস্ত করেছে, তার সঞ্চিত সম্পদ আদায় করে নিয়েছে, আবার কখনও মরুদেশের দূতের সঙ্গে ধনদাসের কলহ বাঁধিয়ে তুলেছে। এটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেনি, এটা করেছে বিলাসবতীর জীবনকে নিষ্কণ্টক করার জন্যে। জয়পুর ও মরুদেশের দুই রাজার মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে সে সুখী হয়েছে, অথচ কৃষ্ণকুমারীর বিপদ আশঙ্কা করে সে কাতর হয়ে বলেছে—

> রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটি আছে! হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চললেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিনীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৪২)

এছাড়া ধূর্তবাজ ধনদাসকে পর্যুদস্ত করাই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাই চতুর্থাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ধনদাসের দুর্ভাগ্য দেখে মদনিকা পরিহাস করে বলেছিল— 'ধনদাস, আমি ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে-হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।' (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৭০)

এছাড়া মদনিকার চরিত্রে রসবোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থাঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে রাজা জগৎসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলে মদনিকা বিলাসবতীকে বললেন— 'ওহে রাধে? এ যমুনা পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলী কচ্যেন। হা হা হা।' (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৬৯)

অনুরূপ চরিত্রের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাই *মৃচ্ছকটিক* নাটকে বসন্তসেনার সহচরী মদনিকার মাঝে। নাটকের প্রথম থেকে শেষ অবধি যে কোনো কাজে অর্থাৎ সারাক্ষণই সে বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের মিলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই নাটকে মদনিকা উচ্ছল, চপল, বাকপটু, আবেগপ্রবণ, প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং মানবতাবোধসম্পন্ন। তাই চতুর্থাঙ্কে যখন শর্বিলক চুরি করা অলংকার নিয়ে তাকে মুক্ত করার জন্য আসে তখন সে বলে—

> যদি আমার বুদ্ধি নাও তো এ অলংকার সেই মহানুভবকেই (চারুদত্তকে) ফিরিয়ে দিয়ে এস। যদি তা না কর তবে আর্যের (চারুদত্তের) লোক হয়ে এই অলংকার আর্যার (বসন্তসেনার) কাছে নিয়ে যাও। তা হলে তুমি চোর হলে না, আর্যেরও ঋণ রইল না আর আর্যাও তার গয়না পেয়ে গেলেন। (শূদ্রক, ১৯৮৬ : ৩৩১-২৭৪)

আবার দ্বিতীয়াঙ্কে মদনিকা বসন্তসেনাকে বলছে—

মদনিকা : আপনার অন্যমনস্কতা দেখে বুঝছি হৃদয়গত কাউকে আপনি কামনা করছেন।
বসন্তসেনা : তুই ঠিক ধরেছিস। পরের হৃদয়বোধে নিপুণা তুই যে মদনিকা।
মদনিকা : কী আনন্দ আমার কী আনন্দ। তরুণজনের মহোৎসব কামদেবকেই আপনি অনুগৃহীত করলেন। তাহলে এবার আর্যা বলুন, তিনি রাজা না রাজার প্রিয় কেউ, যাকে সেবা করবেন আপনি! ইত্যাদি ইত্যাদি। (শূদ্রক, ১৯৮৬ : ৩৩১-২৫২)

এই সংলাপের মাধ্যমে মদনিকার সততা এবং বসন্তসেনা ও চারুদত্তের প্রতি গভীর সহানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয় সহচরী হিসেবে নায়িকার মনোলোকের অবস্থা সে বুঝতে পারে।

সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে নায়কের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তার লক্ষণ প্রখ্যাত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, ত্যাগী, কর্মকুশল, কুলীন, বুদ্ধিমান, রূপমান, তরুণ, উৎসাহী, অনলস, লোকানুরক্ত, তেজ, বৈদগ্ধ্যসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নায়ক বলা হয়।[৪] নায়কের সাধারণ গুণের কথা উল্লেখ করে নাট্যতাত্ত্বিকগণ নায়ককে চারটি এবং বিশদভাবে ৪৮ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন।

ওই শ্রেণিভেদ অনুযায়ী, জগৎসিংহের চরিত্রকল্পনায় ধীরললিত[৫] ও দক্ষিণ নায়কের[৬] লক্ষণ সুস্পষ্ট। জগৎসিংহ চরিত্রের প্রধান বৃত্তি হল কামলোলুপতা। সে প্রকাশ্যে বিলাসবতী নামক এক বারবনিতাকে রক্ষিতা হিসেবে পালন করেছে। জয়পুর নগরে তার ভোগ্য হয়নি এমন রমণী বিরল। এ প্রসঙ্গে ৪র্থ অঙ্কের, ২য় গর্ভাঙ্কে ধনদাসের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য— 'এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?' (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৪)

রাজকার্যে তাঁর বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না। তাই মন্ত্রী-সেনাপতিদের সাহচার্য রেখে ধনদাসের মতো ব্যক্তির সাথে বিশ্রম্ভালাপই তার অধিক কাম্য। কৃষ্ণকুমারীর চিত্রদর্শনে রাজা জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে পাবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ঠিক তেমনি তাঁর রক্ষিতা বিলাসবতীর প্রতিও তার আকর্ষণ প্রবল। তাই ৪র্থ অঙ্কের, ২য় গর্ভাঙ্কে যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে বিলাসবতীকে উদ্দেশ্য করে জগৎসিংহ বললেন—

> আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো। যদি বেঁচে থাকি, তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুলনা, একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো। (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৬৭)

এছাড়া ৪র্থ অঙ্কের, ২য় গর্ভাঙ্কে জগৎসিংহের অদর্শনে বিলাসবতী অভিমান করলে জগৎসিংহ তার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন— 'এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর (পদধারণ)।' (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৬২)

এ রকম আরো উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারী ও বিলাসবতীর প্রতি সমান অনুরাগ পোষণ করেছেন বিধায় সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের বিচারে তাঁকে দক্ষিণ নায়ক রূপে আখ্যায়িত করা যায়।

সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের চরিত্র অপ্রধান হলেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রধানত

হাস্যরসের আধাররূপে বিদূষক চরিত্রটি নাটকে কল্পিত হয়ে থাকে। নাটকীয় ঘটনাজালের গুরুগম্ভীর পরিবেশে বিদূষক প্রায়ই এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে। অল্পসংখ্যক নাটক বাদ দিলে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারেরা প্রায় সকলেই তাঁদের নাটকে বিদূষক চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বিদূষক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্মবপুর্বেষভাষাদ্যৈঃ!
> হাস্যকরঃ কলহরতি র্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্মজ্ঞ ॥ ৩/৫১(বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ১২৩)

এই আলঙ্কারিক নির্দেশ অনুযায়ী ফুল বা ঋতুর নামে বিদূষকের নাম হবে এবং সে তার কর্ম, চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাক্যের দ্বারা সকলের হাস্যোদ্রেককারী হবে। এছাড়া সে কলহপ্রিয় হলেও স্বকর্ম বিষয়ে সচেতন হবে। প্রকৃতপক্ষে, নাটকে বিদূষক নায়কের নর্মসচিবরূপে আবির্ভূত হয় এবং প্রিয়বয়স্যরূপে সে নায়কের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যতখানি অবহিত থাকে ততটা অবহিত হওয়া অন্য কোনো চরিত্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষত নায়িকার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত নায়ক সাধারণত প্রিয়বয়স্য বিদূষকের কাছে তাঁর মনের কথা যেভাবে অকপটে প্রকাশ করে থাকেন, সেভাবে অন্যের কাছে করেন না বা করতে পারেন না। বিদূষক তার বুদ্ধি অনুযায়ী রাজাকে পরামর্শ দেয় এবং এইভাবে সে রাজার প্রণয়ব্যাপারে সহায়ক হয়ে ওঠে। সে সাধারণভাবে আরামপ্রিয় এবং সুখাদ্যের প্রতি তার যে লোলুপতা, সেটা সে গোপন করবার চেষ্টা করে না। তার বুদ্ধিবৃত্তি খুব একটা তীক্ষ্ণ নয় এবং মাঝে মাঝে কোনো বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বা অনুমান করতে গিয়ে সে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিয়ে দর্শকসাধারণের কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়ই *কৃষ্ণকুমারী নাটকের* ধনদাসের চরিত্রে দেখা যায়। সে ছিল রাজা জগৎসিংহের প্রণয়-সহায়ক। কৃষ্ণকুমারীর প্রতি রাজা জগৎসিংহকে আকৃষ্ট করতে নানান রকম কৌশল অবলম্বন করেছিল এই ধনদাস। তাই ব্যাকুল রাজা দূত করে কৃষ্ণকুমারীর কাছে যখন ধনদাসকে পাঠালেন তখন সাবধান করে দিলেন যেন তার কর্ম নিষ্ফল না হয়। এর প্রত্যুত্তরে ধনদাস বলেছে— 'মহারাজ, আপনার কৰ্ম্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস প্রস্তুত।' (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক) এই উক্তির দ্বারা ধনদাসকে রাজার সমব্যথী ও স্নেহপরায়ণ বন্ধুর ভূমিকায় দেখতে পাই। তার চরিত্রে যে লোভ মজ্জাগত ছিল সেটি তার এই উক্তিটিতে ধরা পড়ে—

> (স্বগত) আমার যা কৰ্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের একজন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম! এ কি সামান্য বুদ্ধির কৰ্ম্ম! হা! হা! বিশ সহস্র মুদ্রা! হা! হা! হা! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল। (অবলোকন করিয়া) আহা! কি চমৎকার মণি খানি! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই। যা হৌক, ধন্য ধনদাস! কি কৌশলই শিখেছিলে! জ্যোতির্বেত্তারা বলে থাকেন যে গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্য্যে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন; আমরাও রাজ-অনুচর; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব? (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ১০-১১)

নাটকে বাস্তবতা সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হল, ভাষা ও সংলাপ। সংস্কৃত নাটকে যেমন সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তেমনি আবার কাহিনীর ক্রমবিকাশ এবং চরিত্রের আবেগের প্রকাশ ও বিকাশের সাথে সাথে ভাষা ও সংলাপেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য নাট্যসাহিত্যের মতোই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকে এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। সংলাপের ভাষা বিচারে *কৃষ্ণকুমারী নাটক* সর্বাপেক্ষা পরিণত এবং ত্রুটিমুক্ত। *কৃষ্ণকুমারী নাটকের* সংলাপ যথেষ্ট পরিণত। (সৌরভ, ২০০১ : ৪৪) *শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতীতে* তিনি সুদীর্ঘ সংলাপ, অপ্রয়োজনীয় কবিভাবের উচ্ছ্বাস, সংস্কৃত শব্দালংকার, অর্থালংকার ইত্যাদির সংযোজন করেছেন। কিন্তু *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* এসব বৈশিষ্ট্য বর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* তিনি শেক্সপিয়রীয় রীতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন।

মোট কথা গতানুগতিক সংস্কৃত নাটকের অন্ধ অনুকরণে এ-নাটকের ভাষা ভারাক্রান্ত নয়; কথোপকথনে প্রাণস্পন্দন স্পষ্ট। তবে কবিত্বময় উচ্ছ্বাস প্রকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব যে রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন কি মাঝে মাঝে সংস্কৃত-ঘেঁষা কাব্যিক ধ্বনি-ব্যঞ্জনাময় শব্দের প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভাষা জীবন্ত, মার্জিত, উন্নত ভাষা। *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* স্বগত সংলাপ রয়েছে ৩৩টি, দীর্ঘ সংলাপ ৫৩টি, সংস্কৃত শব্দবহুল সংলাপ ৩৫৫টি, সাধারণ সংলাপ ৪৯০টি। (সাইফুল, ২০০৭ : ৩১২) সংস্কৃত নাটকেও সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার লক্ষণীয়। শুধু চরিত্র অনুযায়ীই নয়, কাহিনীর ক্রমবিকাশ এবং চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশের সাথে সাথে সংলাপে এসেছে ভাষাগত তারতম্য। বিভিন্ন চরিত্রও নিজ নিজ পেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচলিত রীতি প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। এটি সংস্কৃত নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। (নিরঞ্জন, ১৪০০ : ১২৪) সংস্কৃত নাট্যতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক বিশ্লেষণ করে ভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট সূত্র নির্ধারণ করেছেন। সূত্রসমূহে সুস্পষ্টভাবেই চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাট্যাচার্য ভরত থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত সকলেই সংস্কৃত নাটকে সংলাপের ব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এঁদের মতামত অনুযায়ী, মিশ্র, উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রভৃতি সামাজিক বর্ণ বা শ্রেণি অনুসারে পাত্র-পাত্রীর ভাষা নির্দিষ্ট হবে।[৭] সংস্কৃত নাটকে দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণি তথা উচ্চবর্ণীয় চরিত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলে। রানীসহ সকল নারী চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে। আর অপরাপর অনেক চরিত্র (নিম্নবর্ণীয়) প্রাকৃত ভাষায় কথা বলে।

মধুসূদন দত্তও তাঁর নাটকে চরিত্রানুগ ভাষা ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন। তিনি *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* প্রচুর অলঙ্কৃত তৎসম শব্দপূর্ণ ভাষা ও লঘু দৃশ্যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। কথ্য ভাষার উপরে তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে তিনি মেছুনীদের ভাষা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। অথচ তিনি এই ভাষাকেই তার *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* প্রয়োগ করেছেন। (ভবানীগোপাল, ১৯৮৬ : ১৪৬) প্রসঙ্গক্রমে কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করা হলো—

বিলাসবতী : কি হে ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?
ধনদাস : আর কি ভাববো ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম!
বিলাসবতী : আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে বল দেখি?
ধনদাস : আর কে শিখিয়ে দেবে ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে? (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ১৩)

অনুরূপ ভাষা আমরা সংস্কৃত নাটকেও দেখতে পাই। কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ প্রাকৃত অর্থাৎ কথ্য প্রযোজ্য হবে সে-বিষয়ে নাট্যাচার্য ভরত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন —

রাজার অন্তঃপুরবাসীগণ মাগধী ভাষায় কথা বলে; চেট (পরিচারক), রাজকুমার ও শ্রেষ্ঠী (বণিক)-দের ভাষা অর্ধমাগধী; বিদূষকাদির ভাষা প্রাচ্যা, ধূর্তদের অবন্তিজা; নায়িকা ও সখিদের উপযোগী শৌরসেনী; যোদ্ধা, নাগরিকাদি ও দ্যূতকরদের ভাষা দাক্ষিণাত্যা; উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলবাসী খসেরা তাদের স্বদেশী বাহ্লীকা ভাষায় কথা বলে। সুরঙ্গ খননকারী, সন্ধিকার (সম্ভবত সিঁদেল চোর) অশ্বরক্ষক ও বিপন্ন নায়িকাদের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় মাগধী ভাষা প্রযোজ্য। (ভরত, ১৯৮০ : ২০০)

প্রসঙ্গক্রমে আমরা কালিদাসকৃত *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে নগররক্ষীগণ, রাজশ্যালক (নগরপাল) এবং ধীবরের প্রাকৃত ভাষার সংলাপ তুলে ধরছি—

রক্খিণ্যে : (পুরুষং তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভীলআ! কহেহি কহিং তুএ এশে মহামণিভাশুলে উকিন্ন-ণামাক্খলে লাঅকীএ অংগুলি অত্ত্র শমাশাদিএ।
পুরুষ : (ভীতিং নাটয়িত্বা) পশীদন্তু, পশীদন্তু ভাবমিশ্শে। ণ হগে ইদিশ কস্মকালী।
প্রথম : কিং কখু শোহণে বহ্মণেশিত্তি কলিঅ লজ্জা দে পড়িগ হে দিন্নে।
রক্ষীদ্বয় : (লোকটিকে প্রহার করে) ওরে চোর, বল, রাজার নাম খোদাই করা রাজার এই দামী আংটি তুই কোথায় পেলি?
লোকটা : (ভীতির অভিনয় করে) শান্ত হোন, বাবুরা, আমি এমন কম্ম করিনি।
প্রথম রক্ষী : তবে কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মনে করে রাজা তোকে এই আংটিটি দান করেছেন? (কালিদাস, ১৯৮৬ : ৩৯৮-৩৯৯)

সংস্কৃত নাটকে যেমন বর্ণনাত্মক অতিদীর্ঘ সংলাপ-সংযোজনের রীতি প্রচলিত, তেমনি মধুসূদন দত্ত *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* প্রায় অর্ধশত দীর্ঘ সংলাপ সংযোজন করেছেন। বলেন্দ্রসিংহ যোদ্ধা হলেও তাঁর চরিত্রে পৌরুষ অপেক্ষা কোমলতা অধিক। পঞ্চমাঙ্কের, ৩য় গর্ভাঙ্কে নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে হত্যা করতে তাঁর শয়নমন্দিরে এসে তিনি পৌরাণিক উপমা সমন্বিত সংস্কৃতানুগ ভাষা ব্যবহার করেছেন —

হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন ভিন্ন কত্যে এলেম? এমন সুবর্ণ মন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে? তা কি করি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই! (ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৬১ : ৮৬)

এছাড়াও মধুসূদন দত্ত প্রাচীন সাহিত্য অর্থাৎ *রামায়ণ, মহাভারত* থেকেও প্রচুর উপমা সম্বলিত সংলাপ *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* ব্যবহার করেছেন। সুতরাং *কৃষ্ণকুমারী* নাটকের ভাষা

ও সংলাপ ব্যবহারে সংস্কৃত নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষ প্রভাব যে নেই তা বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্তের অভিমতটি স্মরণ করা যেতে পারে—

> কৃষ্ণকুমারীর কোথাও কোথাও সংলাপে সংস্কৃতানুকারী ভাষা ভঙ্গির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উপমাদির প্রয়োগ, শব্দ-ব্যবহারে তৎসমের প্রতি প্রবণতা বাগ্‌ভঙ্গিতে পরোক্ষ জটিলতা, মন্থরতা ও অকারণ কবিত্ব এ নাটকের সংলাপ থেকে প্রাধান্য হারিয়েছে কিন্তু লুপ্ত হয়নি। (ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৩৬৯ : ১৯৪-১৯৫)

তাছাড়া সংস্কৃত নাট্যতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, স্ত্রী ও অন্যান্য চরিত্রের লোকের ভাষা প্রাকৃত অর্থাৎ কথ্য শ্রেণির হয় সেটাও মধুসূদন দত্ত মেনে নিয়েই তাঁর নাটকে প্রয়োগ করেছেন। তাই বলা যায়, মধুসূদন দত্ত শত চেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের বিধৃত নাটকের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন নি। তাই বারবার ফিরে এসেছেন তাঁর মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রাচ্য ভাবনায়।

স্বাতন্ত্র্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের যুগধর্মের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ তাঁকে যতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল, সংস্কৃত নাটকও তাঁকে ততখানিই উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নাটকের বহির্মুখী কিংবা অন্তর্মুখী প্রভাব যাই থাকুন না কেন, তাঁর সকল নাটকেই তিনি স্বতন্ত্রতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন সমাজ ও জীবন চেতনা তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল বলেই পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত নাটকের প্রভূত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিতেই নাটক রচনা করেছেন।

কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যে দীর্ঘকালের সংস্কারের একটি বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তিনি জগৎসিংহ এবং ভীমসিংহকে ইতিহাস অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু অন্য চরিত্রগুলোকে নিজস্ব কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তিনি মহাকবি কালিদাস কিংবা শূদ্রক প্রণীত নাটকের অনুরূপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যেন নতুনত্বের ছোঁয়া রয়েছে। *কৃষ্ণকুমারী নাটকেও* একটি বারবনিতার চরিত্র আছে। বারবনিতার চরিত্রটি সংস্কৃত *মৃচ্ছকটিকম্* নাটকের অনুরূপ চরিত্র হতে এসেছে। কিন্তু মধুসূদন বারবনিতার জীবনকে বাস্তবরূপে প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত সংযতভাবেই তার সংলাপ ব্যবহার করেছেন এবং তার জীবন ও আচরণ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত নাটক কিংবা কাব্যের যে সকল নাম তাঁর নিকট শ্রুতিসুখকর এবং আর্কষণীয় বলে বোধ হয়েছে, তা তিনি তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন সত্যি কিন্তু একেবারে অন্ধ অনুকরণ করে চরিত্রের হুবহু বৈশিষ্ট্য তুলে আনেননি, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই চলেছেন।

উদয়পুরের রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রটি শেক্সপিয়রের *The Life and Death of King John* নাটকের ফিলিপ চরিত্রের প্রভাবজাত হলেও এই ঐতিহাসিক কাহিনির পরিবেশের মধ্যে মধুসূদন যথাসম্ভব মৌলিকতা রক্ষা করেছেন। কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার পর

ভীমসিংহের উন্মাদ আচরণ শেক্সপিয়রের *King Lear* নাটকের নায়ক চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ হলেও মধুসূদন সেই উন্মাদনাকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মদনিকা স্ত্রীচরিত্রটির পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করার চিত্রটি শেক্সপিয়রের *As You like It* নাটকের একটি স্ত্রীচরিত্রের প্রভাবজাত হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। কৃষ্ণকুমারীর সাথে শকুন্তলার চরিত্রগত মিল, ধনদাসের চরিত্রের সঙ্গে *মৃচ্ছকটিকম্* নাটকের রাজা পালকের শ্যালক ভিলেন সংস্থানক (শকার)-এর মিল, রক্ষিতা বিলাসবতীর জগৎসিংহের প্রতি ভালোবাসা আর গণিকা বসন্তসেনার চারুদত্তের প্রতি ভালোবাসা একই সূত্রে গাঁথা। সেই ভালোবাসা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। স্বদেশ এবং স্বজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণকুমারীর আত্মবলিদান সত্যিই অভিনব। মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বকীয়তা বজায় রেখে বাংলা নাটক রচনা করেছেন, এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

পরিশেষে বলা যায়, নাট্যকার হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবসময়ই ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার সাধনা করেছেন বলেই কর্নেল জেমস টডের ঐতিহাসিক গ্রন্থ *অ্যানলস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান* থেকে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকৃত না করে *কৃষ্ণকুমারী নাটকটি*র বীজ সংগ্রহ করেছেন। আসলে আন্তর্জাতিক নাট্য পরিধিকে স্পর্শ করাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক এষণা, তাঁর প্রাণচঞ্চল সত্তার স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই তিনি তাঁর *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* দেশীয় পরিধি অতিক্রম করে নিজের সৃষ্টিতে আর্ন্তজাতিক নাট্যচিন্তার সংশ্লেষ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি একান্ত নিজস্ব নাট্যবিশ্ব নির্মাণ করার জন্য অভিনিবিষ্ট ও ঐকান্তিক ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি সংস্কৃত নাটকের বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। তাঁর অবচেতন মনে প্রাচ্য আর্দশ যে স্থির রেখায় মুদ্রিত হয়েছিল, ইউরোপীয় কলা কৌশল দ্বারা তা নতুন আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে মাত্র। *কৃষ্ণকুমারী নাটক* রচনাকালে মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত নাটকের কোনো কোনো চরিত্র হুবহু তুলে ধরেছেন। নাটক রচনাকালে মধুসূদনের মনে সংস্কৃত নাটকের কোনো কোনো চরিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল বলেই তিনি নাটকে তপস্বিনীর নামকরণ করেছেন কপালকুণ্ডলা। এই নামটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতি রচিত *মালতী-মাধব* নাটকের কাপালিকের শিষ্যা কপালকুণ্ডলার নাম থেকে যে নেওয়া হয়েছে তা বোঝা যায়। অবশ্য নাম ছাড়া উভয় চরিত্রের মধ্যে আর কোনো সাদৃশ্য নেই। মদনিকা নামটিও গৃহীত হয়েছে *মৃচ্ছকটিকের* বসন্তসেনার সখী মদনিকার নামসাদৃশ্যে; *কৃষ্ণকুমারী নাটকের* বিলাসবতী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার মতোই সাধারণ, অর্থলোভী নয়, তবে অনুরাগিণী। রাজনটী বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি যে রকম আন্তরিক অনুরাগ পোষণ করতেন, বিলাসবতী বারাঙ্গনা হয়েও জগৎসিংহকে তেমনই অন্তরের অকৃত্রিম ভালোবাসা নিবেদন করে পবিত্র প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ধনদাসের শাঠ্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা শকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা জগৎসিংহের চরিত্রে ঐতিহাসিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকলেও তার উপর সংস্কৃত শৃঙ্গার-রসাত্মক নায়ক অগ্নিমিত্রের প্রভাব বিদ্যমান। কৃষ্ণকুমারীর স্বভাবের কোমলতা ও নান্দনিকতা শকুন্তলা চরিত্রের অনুরূপ। তাছাড়া চিত্রফলক দর্শনে অনুরাগের উন্মেষ এবং কৃষ্ণকুমারীর

স্বপ্ন প্রসঙ্গে 'আকাশে কোমল বাদ্য' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি প্রথাবদ্ধ পদ্ধতির প্রভাব বিদ্যমান। নাট্য সংলাপের মধ্যেও প্রাচ্য প্রভাবের প্রচুর উপকরণ আছে। যদিও সংস্কৃত নাটকের বহিরঙ্গরূপ *কৃষ্ণকুমারী নাটকে* গৃহীত হয়নি কিন্তু তাঁর মনের ভিতর যে সুপ্ত পৌরাণিক জগৎ লুকিয়ে ছিল তা বেরিয়ে এসেছে *রামায়ণ, মহাভারত* ও *পুরাণ*-এর বিভিন্ন সংলাপ প্রয়োগের মাধ্যমে। মোটকথা *কৃষ্ণকুমারী নাটকের* উপর কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্* এবং শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকম্* নাটকের সাদৃশ্য যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি একইভাবে নির্দেশ করা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বতন্ত্র নাট্যপ্রতিভার কথাও।

টীকা

১. সংস্কৃত নাটকের শুরুতে নান্দী অর্থাৎ দেব, দ্বিজ নৃপ ইত্যাদির আশীর্বাদ সংযুক্ত ভাষণের প্রয়োগ হয় বলে একে নান্দী বলা হয়। এতে মঙ্গলসূচক শঙ্খ, চন্দ্র, পদ্ম, চক্রবাক শ্বেতপদ্ম প্রভৃতির বর্ণনা থাকবে এবং দ্বাদশ বা অষ্ট পদ থাকবে।

২. প্রকরণের বিষয়বস্তু হবে লৌকিক ও কবি-কল্পিত; অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার এবং নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক। তিনি ধীরপ্রশান্ত শ্রেণির নায়ক হবেন এবং নশ্বর ধর্ম, কাম ও অর্থে আসক্ত হবেন।

৩. দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভুব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্ব ॥
অপিচ
ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকিং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্টা
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোহগ্নিং প্রবিষ্ট ॥ ১/৩-৪ (শূদ্রক, ১৯৮৬ : ৩৫৭)

৪. ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধশীলবান্ নেতা॥ ৩/৩৬ (বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ১১৫)

৫. নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং
কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ॥ ৩/৪০(বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ১১৭)
অর্থাৎ অমাত্য প্রভৃতি বিশ্বাসী লোকদের উপরে কর্মভার দিয়ে যিনি নিশ্চিন্ত, সর্বদা মৃদুস্বভাব, যিনি নৃত্যগীতাদিকলাপরায়ণ তিনি হলেন ধীরললিত নায়ক।

৬. এষু ত্বনেকমহিলাসু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ॥ ৩/৪৩ (বিশ্বনাথ, ১৩৮৬ : ১১৮)
অর্থাৎ বহু স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগবিশিষ্ট নায়ককে দক্ষিণ নায়ক বলা হয়। নতুন প্রেমিকার প্রতি অনুরক্ত হয়েও যিনি জ্যেষ্ঠা প্রেমিকার প্রতি পূর্ববৎ ব্যবহার করেন, তাঁর প্রতি উদাসীন হন না, এমন কি তাঁর এই নতুন প্রণয়ের কথা জ্যেষ্ঠা প্রেমিকাকে বুঝতে দেন না, তাঁকে দক্ষিণ নায়ক বলা হয়।

৭. নাটকং মিশ্রং কর্তব্যম্। উত্তমাধমমধ্যমপাত্রানাং ভাষাভির্মিশ্রং কর্তব্যম্॥ (সাগরনন্দী, ১৩৮৫ : ১৪)

গ্রন্থপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ, ১৯৭৬ । *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, জেনারেল, কলকাতা।
আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২০০২। *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, পঞ্চম সংস্করণ, এ. মুখার্জি এন্ড কোং, কলকাতা।

কালিদাস, ১৯৯২। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ২য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

কালিদাস, সন : অজ্ঞাত। *কালিদাসের গ্রন্থাবলী*, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ, সপ্তম সংস্করণ হতে পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা।

ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৩৬৯। *নাট্যকার মধুসূদন*, গ্রন্থ- নিলয়, কলকাতা।

ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), ১৯৯৯। *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম সংস্করণ, পত্র নং-৭৯, কলকাতা।

খসরু পারভেজ (অনূদিত), ২০০৭। *মধুসূদনের চিঠি*, একুশে বই মেলা, ঢাকা।

নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, ১৯৮৬। *কালিদাসের মালবিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, ১৩৮৬। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *সাহিত্যদর্পণ*, ২য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫২। *মধুসূদন দত্ত*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), ১৩৬১। *মধুসূদন গ্রন্থাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা।

ভবানীগোপাল সান্যাল (সম্পাদিত), ১৯৮৬। *কৃষ্ণকুমারী নাটক*, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, কলকাতা।

ভরত, ১৯৮০। *নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, ১৯২৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ৫ম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

শূদ্রক, ১৯৮৬। জ্যোতিভূষণ চাকী প্রমুখ সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (৭ম খণ্ড), *মৃচ্ছকটিকম*, নবপত্র প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ, কলকাতা।

সাগরনন্দী, ১৩৮৫। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (অনূদিত), *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

সৌরভ সিকদার, ২০০১। *মধুসূদনের ভাষা ও শৈলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

A. Berriedale Keith, 1998. *The Sanskrit Drama*, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi.

প্রবন্ধপঞ্জি

নিরঞ্জন অধিকারী, ১৪০০। *সংস্কৃত নাট্যকলা ও নাটক : প্রাকৃত সংলাপ*, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা প্রথম, কার্তিক সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাইফুল ইসলাম, ২০০৭। *মধুসূদনের নাটকের ভাষা*, কলা অনুষদ পত্রিকা, সংখ্যা-১, জুলাই সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।